‘গণদেবতা’ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বা লোকজ উপাদানের সাধারণ পরিচয়

আমরা জানি যে, বিশেষ একই ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিবেশে যখন অনেক মানুষ সংহত হয়, তখন সেই সংহত জনগোষ্ঠীকে বলা হয় ‘ফোক’ বা লোক আর এই সংহত জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা, আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি,আহার্যসামগ্রী পোষাক-পরিচ্ছদ এককথায় তাদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণই হল লোক-উপাদান বা লোকজ উপাদান। এই লোক-উপাদানের শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ্ বিভিন্নভাবে করেছেন। তবে তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে বিধৃত লোকজ উপাদানগুলিকে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি। সেগুলি হল - ১. অবস্তুনির্ভর লোক-উপাদান ২. বস্তুনির্ভর লোক-উপাদান ও ৩. প্রয়োগকলামূলক লোক-উপাদান।

১. অবস্তুনির্ভর লোক-উপাদান : ১. বস্তুনির্ভর লোক-উপাদানের একটা বড় অংশ বাক্-নির্ভর। ‘বাক্’ অর্থে মুখ বা মুখের কথা। অর্থাৎ লোকসমাজের মুখে মুখে সৃষ্ট এবং প্রচারিত সংস্কৃতির ধারাটিই এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। লোকসাহিত্যের এই ধারাটিকে তাই বলা হয় গ্রাম্য বা লোক বা মৌখিকসাহিত্য। এই ধরনের লোকজ উপাদানের মধ্যে আমরা ছড়া, প্রবাদ, লোকসংগীত, ধাঁধা, লোকনাট্য ইত্যাদিকে রাখতে পারি।

২. বস্তুনির্ভর লোক-উপাদান : লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুসমূহকেই বলা হয় বস্তুনির্ভর লোক-উপাদান। লোকসমাজের ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি, আসবাবপত্র, আহার্যসামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র, তাদের জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে এই ধরনের লোক-উপাদানের মধ্যে আমরা রাখতে পারি।

৩. প্রয়োগকলামূলক লোক-উপাদান : লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ হল প্রয়োগকলামূলক লোকসংস্কৃতি। লোকসমাজ অনেকসময় মানসিক আনন্দবিধানের জন্য বা অবসর বিনোদনের জন্য নানারকম ক্রীড়া, নৃত্য, অভিনয়, উৎসব ইত্যাদিতে মেতে ওঠে। একেই বলা হয় প্রয়োগকলামূলক লোক-উপাদান।

তারাশঙ্কর ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে পূর্বোক্ত লোক-উপাদানগুলির প্রায় সবকটিকেই নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। অবস্তুনির্ভর লোকজ উপাদানের মধ্যে অন্যতম হল লোকসংগীত। এ উপন্যাসে দেখি, দীর্ঘ পনেরো মাসের কারাবাস শেষে দেবু গ্রামে ফিরেছে। গ্রামের সকলে দেবুকে আন্তরিক ভাবে গ্রামে স্বাগত জানিয়েছে। সেইদিনই সন্ধ্যায় সতীশ বাউরি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে

তাদের পাড়ার ঘেঁটুগানের আসরে। চৈত্র মাসের এক মোহময় সন্ধ্যায় সতীশদের পাড়ার ঘেঁটুগানের আসর বসেছে। সেই আসরের সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন তারাশঙ্কর। ঢোলক ও মন্দিরার সঙ্গতের সঙ্গে, গায়কেরা প্রথমে গেয়েছে প্রথাগত ঘেঁটুগান—

এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত।
মহান্ত ভাইরে,
ফুল তুলতে যাই রে,
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে!

এই গানটি ঘেঁটুর বন্দনার গান। ঘেঁটুর বন্দনা গানটি শেষ হবার পর আরম্ভ হয়েছে অন্য ধরনের গান, স্থানীয় বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে এদের যে নিজস্ব গান আছে সেই গান। যেমন, একবার এ অঞ্চলে অতিবৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিষয়কে অবলম্বন করে এদের বাঁধা গানটি এইরকম —

হায় এ জল কোথা ছিল।
জলে জলে বাংলা মুলুক ভে-সে গেল।

স্থানীয় বিশেষ ঘটনা, যা জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল সেই বিষয় অবলম্বনে এই গানটি গাওয়া হয়েছে। গানটিতে আছে বন্যার প্রসঙ্গ। বহুদিন আগে এ অঞ্চলে রেললাইন পাতা হয়েছিল, সে বিষয় নিয়েও এরা গান বেঁধেছে— সাহেব রাস্তা বাঁধালে;

ছ'মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।

এই গানটিতে রেলওয়ে-লাইন পাতার প্রসঙ্গ আছে। ব্রিটিশ সরকার রেল লাইন স্থাপন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতি সাধন করেছিল, সে কালের গ্রামের লোকের কাছে এই রেললাইন এবং রেলগাড়ি ছিল অতি বিস্ময়ের জিনিস, সতীশের গানে সেই বিস্ময়ই যেন ভাষা পেয়েছে।

খরা বা অজন্মা হলে কৃষিপ্রধান গ্রামীণ জীবনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে নেমে আসে চরম বিপর্যয় বা সকলেরই জানা। গ্রাম-জীবনের সঙ্গে জড়িত তারাশঙ্করও এ বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই সতীশের বাঁধা একটি ঘেঁটুগানে এই অজন্মার বাণীরূপ তিনি দিয়েছেন এভাবে —

ঈশাণ কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো,
এক ছিলম তামুক দাও গো সঙ্গে আছে হুঁকো।।

অজন্মার বৎসরে তামাকও অপ্রতুল, তাই অন্যের কাছে 'তামুক' চেয়ে খাবার প্রসঙ্গ - এ গানে উঠে এসেছে।

এরপর এই ঘেঁটুগানের আসরে সেদিন তারা গাইল গ্রামে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জমি-জরিপের কাজ, এবং সেই জরিপের কাজকে কেন্দ্র করে দেবুর সঙ্গে কানুনগোর বিরোধের ঘটনাকে

অবলম্বন করে নিজেদের বাঁধা দীর্ঘ এক গান। পঞ্চগ্রামের নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়েমি জীবনকে সাম্প্রতিক কালে যে ঘটনা বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে সেই ঘটনাটি হল গ্রামে জমি-জরিপের কাজে আসা সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে দেবুর কারাবরণ ও চোখের জলে গ্রামের লোকের দেবুকে বিদায় জানানো, এ সব প্রসঙ্গই আনুপূর্বিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এ গানে। দেবুর কারাবরণের ঘটনাটি সমকালীন পঞ্চগ্রামের জীবনকে কীভাবে আলোড়িত করেছিল। গ্রামীণ মানুষেরা দেবুর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছিল- এ গানে যেন সেই ইতিবৃত্তই ধরা পড়েছে। এইভাবেই এই লোকসংগীতটি উপন্যাসটির বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সৃজনেও সহায়ক হয়েছে অনেকখানি।

লোকসংগীতের মতো লোকছড়ার উল্লেখও রয়েছে এই উপন্যাসে। আমরা জানি, বারো মাসে তের পার্বণ পালিত হয় এই বাংলায়। এরকমই পৌষসংক্রান্তিতে বাংলার প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি গৃহে পৌষপার্বণ উপলক্ষে হয় পৌষলক্ষ্মীর পুজো। আর এই পৌষলক্ষ্মীর পুজো উপলক্ষে মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে পৌষ আগলানোর ছড়া আমরা শুনেছি এই উপন্যাসে। আমাদের অতি পরিচিত সেই ছড়াটি এইরকম– "পৌষ পৌষ সোনার পৌষ

এস পৌষ যেয়ো না -জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ - না যেয়ো ছাড়িয়ে,
স্বামী-পুত্র ভাত খাবে কটোরা ভরিয়ে।
পৌষ পৌষ সোনার পৌষ...।" বাংলার গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষের কাছে পৌষ হল সম্পদের মাস, সমৃদ্ধির মাস। গ্রাম-বাংলার প্রতিটি গৃহ এ সময় থাকে শষ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই গ্রামীণ লোকসমাজ এই সময় পৌষলক্ষ্মীর পুজোর মাধ্যমে তাদের এই সমৃদ্ধি যেন চিরস্থায়ী হয় সেই কামনা করে। গ্রামীণ মানুষের সেই কামনার প্রতিচ্ছবিই এ ছড়াটিতে ফুটে উঠেছে।

'কানামাছি' বাংলার শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় একটি খেলা। 'গণদেবতা' উপন্যাসে আমরা দেখি, নিঃসন্তান পদ্ম গ্রামের একদল ছোট্ট ছেলের সঙ্গে তার বাড়ির উঠোনে এই কানামাছি খেলায় মেতে উঠেছে আর এই খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ছড়াও সে ছেলেদের সঙ্গে আবৃত্তি করেছে। সেই ছড়াটি এই রকম :

ভাত করে কি ?
টগ-বগ!
মাছ করে কি ?
ছ্যাঁক-ছোঁক।
হাটে বিকোয় কি ?
আদা।
তবে ধরে আন তোর রাঙা রাঙা দাদা।

এই ছড়াটি প্রশ্নোত্তরমূলক। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন একজন শিশু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীড়ারত অন্যান্য শিশুরা উপযুক্ত উত্তরদানের মাধ্যমে ছড়াটির পরবর্তী পাদটি পূরণ

করেছে। ছোট্ট শিশুদের সঙ্গে এ ভাবে খেলায় মেতে উঠে নিঃসন্তান পদ্ম তাঁর জীবনের অফুরন্ত দুঃখ ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে থাকতে পেরেছিল।

লোকসংগীত ও ছড়ার মতো প্রবাদও একটি অবস্তুনির্ভর লোক-উপাদান। গণদেবতা উপন্যাসে তারাশঙ্কর অজস্র প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন :

শক্তর সব দুয়ার মুক্ত।

হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি ।

রাজা **বিনে রাজ্য নাশ ।**

ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই ।

দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধরে ।

হাতের মারে কিছু হয় না চাই ভাতের মার ।

দশে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ ।

গাধা পিটে কখনও ঘোড়া হয় না ।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ।

সে রামও নাই- সে অযুধ্যেও নাই। ইত্যাদি

বস্তুনির্ভর লোক-উপাদানের অন্তর্গত লোকনেশা হিসাবে তামাক, মদ, ভাং,বিড়ি ইত্যাদির বহুল উল্লেখ রয়েছে এ উপন্যাসে। এছাড়া **লোকবাদ্যযন্ত্র** হিসাবে পাই **ঢাক, মন্দিরা, খোল, করতাল** ইত্যাদি। **লোকঅস্ত্র টাঙ্গি, গুপ্তি, বগি-দা, লাঠি** ইত্যাদিরও উল্লেখ রয়েছে। আরও যে সব বস্তুগত লোকজ উপাদান রয়েছে সেগুলি হল–

লোকযন্ত্র : কোদাল, কুড়ুল, ফাল, ক্ষুর, হাত-করাত, লাঙল, হাতুড়ি, সাড়াশি, কাস্তে

লোকযান- গরুর গাড়ি

লোকপ্রসাধন : ফিতা, টিপ, আলতা, গন্ধ (এসেন্স)

লোকঅলঙ্কার : মাকুড়ি, নাকছাবি, শাখা, বালা, নোয়া

লোকতৈজস : ঘড়া, ঘটি, গাড়ু, মাটির সরা, মাটির হাঁড়ি, পিতল- কাঁসার বাসন

লোকশিল্প : তালপাতার চাটাই, মাটির পুতুল, মাদুর, পলুই, ঝুড়ি

লোকক্রীড়া : কানামাছি খেলা, কুস্তি

প্রয়োগকলামূলক লোক-উপাদান হিসাবে বেশ কয়েকটি লোক উৎসবের উপস্থিতি উপন্যাসটিকে যেন অনেক বেশি করে লোকায়ত জীবনকেন্দ্রিক করে তুলেছেন। এই উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজের সর্ববৃহৎ উৎসব নবান্নের উল্লেখ আছে।নবান্ন উৎসব শেষ হতে না হতেই অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ইতুলক্ষ্মীর পুজো করে শিবকালীপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষেরা। বাংলাদেশের অন্যত্র ইতুপূজা অর্থে সূর্যদেবতার পূজা হলেও, এই রাঢ় অঞ্চলে ইতুপূজা কিন্তু এক অর্থে লক্ষ্মীরই পূজা। তাই এইসময় রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা তাদের খামারের ঠিক মাঝখানে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটি পুতেঁ সেই খুঁটির তলায় আল্পনা দিয়ে সেইখানে লক্ষ্মীর পূজা দেয়। পৌষ-সংক্রান্তিতে পৌষ-পার্বণ উৎসবের উল্লেখ রয়েছে এই উপন্যাসে। এই পৌষ-পার্বণে গ্রামের প্রতিটি মানুষের বাড়িতেই বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পিঠে তৈরি হয়। পৌষ-পার্বণ শেষ হতে না হতেই

চৈত্রমাসে লোকসমাজ করে ঘন্টাকর্ণের পুজো। ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণের পুজো শেষ হতে না হতেই চলে আসে গাঁজন। গ্রামীণ জনজীবনে এই গাজন আরো একটি বড় উৎসব।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন অনুষ্ঠিত হয় আর তার আগের দিন গ্রামীণ মহিলারা পালন করে নীলষষ্ঠী।এই চৈত্র মাসেই গ্রামীণ লোক নারীরা আরও একটি ষষ্ঠীর ব্রত ও উপবাস করে থাকেন-- সেটি হল অশোক ষষ্ঠী। পূর্বে উল্লেখিত ষষ্ঠীগুলি ছাড়াও গ্রামীণ নারীরা যে 'বারো মাসে তেরো ষষ্ঠী' পালন করে তার উল্লেখও রয়েছে এই উপন্যাসে। তারা বৈশাখ মাসে পালন করে 'চন্দন-ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য-ষষ্ঠী, আষাঢ়ে বাঁশ-ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুন্ঠন বা লোটন-ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা বা চাপড়-ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে কালী-ষষ্ঠী, অগ্রাহায়ণে অখণ্ড-ষষ্ঠী, পৌষে মূলা-ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা-ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ-ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোক-ষষ্ঠী ও নীল-ষষ্ঠী' -- এইভাবে গ্রামীণ নারীরা সংসার, স্বামী ও সন্তানের কল্যাণের জন্য এই ষষ্ঠীগুলি নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। গ্রামীণ লোকসমাজের জীবনাচরণের সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারাশঙ্কর এইভাবেই লোকসমাজে প্রচলিত প্রতিটি ব্রত, উৎসব ও অনুষ্ঠানের এক মনোজ্ঞ চিত্র অংকন করেছেন এই উপন্যাসে।

এইভাবেই লোকজীবনের সার্থক শিল্পি তারাশঙ্কর কৃষিজীবি গ্রামীণ লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত প্রায় প্রতিটি লোকজ উপাদানকেই শিল্পসঙ্গত ভাবে সাঙ্গীকৃত করেছেন তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসে । এর ফলে উপন্যাসটি যে শিল্প সার্থকতার উত্তুঙ্গ শিখরে উন্নীত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।